যুগান্তর

তারিখ ... 18 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ..৫... কলাম..১.. ... .

শিক্ষকদের কি এই নৈতিক স্খলন সাজে?

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার

নৈতিক স্খলনের মধ্যে কেবল যৌন কেলেংকারিই পড়ে না। অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের নম্বর বেশি দেয়া, স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, অন্যের লেখা নকল করে প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ রচনা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। যৌন অপরাধ বা অন্য কোনো একাডেমিক দুর্নীতি করে ধরা পড়লে শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা হয় না। অভিযুক্তের দলীয় পরিচয়কে বিবেচনায় নেয়ার কারণে অনেক সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত সঠিক পথে পরিচালিত হয় না। তদন্তের ধীরগতির কারণে অনেক তদন্তে ভাটা পড়ে।

শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীদের রোল মডেল। তিনি হবেন শিক্ষার্থীদের 'ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড'। শিক্ষার্থীরা কেবল শিক্ষকের কাছে পাঠগ্রহণ করেন না, তার কাছে শিখেন সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নেয়ার স্বপ্ন রচনা এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের কলাকৌশল। আদর্শ শিক্ষক কেবল পাঠ্যক্রমে উল্লেখিত বিষয়ের গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না, সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে সমাজ, দেশ ও মানবতার কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ একজন পরোপকারী মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। যে শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এভাবে গড়ে ও বেড়ে ওঠে, যার প্রদর্শিত পথে শিক্ষার্থী নিজের জীবন ও ক্যারিয়ার গড়ে তোলে, ছাত্রছাত্রীরা কেন তেমন শিক্ষককে সম্মান করবে না? কেন তাকে একাডেমিক অঙ্গনের পিতৃত্বের আসনে বসাবে না? পিতা-মাতা জন্ম দিলেও শিক্ষার্থীর একাডেমিক জগতের পিতা বা গুরু যে তার শিক্ষক সে কথা তো অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার্থীরা একজন আদর্শ শিক্ষকের কাছে কেবল ছাত্রই নয়, তারা তার স্বপ্ন, তার সন্তানসন্তুতি, যাদের মধ্য দিয়ে তিনি তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। এজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ছাত্র শিক্ষককে ছাড়িয়ে গেলে শিক্ষাপ্রদান সার্থক হয়েছে ভেবে গর্বে শিক্ষকের বুক ভরে ওঠে।

তাত্ত্বিকভাবে এসব কথা শুনতে ভালো লাগে। অনেক দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে এমন গঠনমূলক সম্পর্ক থাকলেও বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাঙ্গনের বাস্তবতা ভিন্ন। এ দেশে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে নৈরাজ্যিক চরিত্র দিয়েছে। ফলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হচ্ছে। নিচে নামছে শিক্ষকতার মান এবং সম্মানিত শিক্ষকের মর্যাদা। নিজ একাডেমিক ডিসিপ্লিনে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান শিক্ষকের সংখ্যা কমে আসছে। বর্তমানে কিছুসংখ্যক এমন শিক্ষক থাকলেও এদের অবসরের পর ওই জায়গা পূরণ করার মতো উদীয়মান গবেষক শিক্ষক উঠে আসছেন না। কারণ, অনেক শিক্ষক এখন একাডেমিক গবেষণার চেয়ে বর্ণের আবরণে চলমান দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশি মনোযোগী। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও গবেষণা মনোযোগী না হয়ে অনেক শিক্ষকই অধিকতর মনোযোগী হচ্ছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান, কনসালটেন্সি, হেকেপসহ অন্যান্য প্রজেক্ট এবং সন্ধ্যাকালীন প্রোগ্রামে পাঠদানের প্রতি। এতে অর্থপ্রাপ্তি ঘটলেও শিক্ষকদের একাডেমিক চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? এর কারণ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে বর্ণের আবরণে (নীল, সাদা, গোলাপি, ইত্যাদি) শিক্ষকদের তীব্র দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতা এবং ছাত্রদের একাডেমিক স্বার্থবিবর্জিত জাতীয় দলীয় রাজনীতির লেজুড়ভিত্তিক রাজনীতি যে এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ তা বলা যায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একাডেমিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে নয়, বরং দলীয় বিবেচনাকে আমলে নিয়েই সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হচ্ছে। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির মতো বিষয়গুলোর ওপরও পড়ছে দলীয় রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব। সম্প্রতি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারী, এমনকি শিক্ষক নিয়োগে দলীয় প্রভাব এবং অবৈধ আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কাজেই শিক্ষক নিয়োগের সময় যদি একাডেমিক যোগ্যতাকে প্রাধান্য না দেয়া হয়, পদোন্নতির সময় যদি শিক্ষকের শ্রেণী কক্ষের পারফরম্যান্সকে মূল্যায়ন না করা হয়, তাহলে কীভাবে আদর্শ শিক্ষক সৃষ্টি হবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভিসিকে হতে হয় খ্যাতিমান একাডেমিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ১৯৭৩-এর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ লংঘন করে দলীয় বিবেচনায় ভিসি নিয়োগ দেয়ায় এ পদে অনেক ক্ষেত্রেই সে ধরনের ব্যক্তিত্ব আসছেন না। অনেক সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি অনিয়ম ও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। ভিসিদের আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রমাণিত হলেও তাদের শাস্তির উদাহরণ বিরল। ফলে নতুনভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ পদে আগতরা দুর্নীতি ও অনিয়ম চর্চায় ভয় পাচ্ছেন না। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কিছু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে অধ্যাপকদের আগমন ও প্রত্যাগমন প্রক্রিয়া জরিপ করে দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে নবনিযুক্ত ভিসি মহোদয়কে সংবর্ধনা দেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই বিদায়ী ভিসিকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়া হয়নি, বা দেয়া যায়নি। অন্যভাবে বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রেই বিদায়ী ভিসিরা তাদের মেয়াদকালে এত বেশি নেতিবাচক কাজ করেন যে, ক্ষমতা ছাড়ার পর তারা আর জনসমক্ষে এসে বিদায় নিতে স্বচ্ছন্দবোধ করেননি। পদ থেকে সরে গিয়ে নিভৃতচারীর মতো মুখ লুকিয়ে থেকেছেন। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কী হতে পারে!

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে কেবল যে একাডেমিক চর্চা ও শ্রেণীকক্ষে পারফরম্যান্সের মান হ্রাস পাচ্ছে তা নয়, তাদের নৈতিকতার মানও ধসে পড়ছে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষকেরই নৈতিক স্খলন ধরা পড়ছে এবং তদন্ত করে সেসব অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাদের শাস্তি হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এক ছাত্রীর যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ফলিত গণিত বিভাগের একজন অধ্যাপককে শাস্তি দেয়া হয়েছে। এ অপরাধের জন্য এ অধ্যাপক চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত হন এবং তার পেনশনের প্রায় সোয়া কোটি টাকা হারান। এলপিআরে যাওয়া একজন বয়স্ক শিক্ষক যদি যৌন অপরাধ করেন, তাহলে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে কীভাবে নিরাপদ বোধ করবে? এছাড়া বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যৌন কেলেংকারির খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ রকম প্রকাশিত নামের তালিকাটি বেশ দীর্ঘ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট ২১ এপ্রিলের সভায় ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদা বিভাগের একজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীর করা যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। এর আগে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ কমিটি অভিযোগ তদন্ত করে গত বছর ২৭ এপ্রিল ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার সুপারিশ করেছিল। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ কৌশল বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী প্রক্টর কর্তৃক সুন্দরী ছাত্রী টার্গেট করে নিজ অফিস, ফ্ল্যাট, বা ল্যাবে নিয়ে যৌন নির্যাতন করার কাহিনী সম্প্রতি প্রায় সব জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মামলা, গ্রেফতার ও রিমান্ডের পর ওই শিক্ষক ১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দিতে ছাত্রীদের যৌন নির্যাতন করার ঘটনা স্বীকার করেছেন। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসির বিরুদ্ধেও ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। তার যৌন লালসার শিকার হয়ে এক ছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগ রয়েছে (যুগান্তর, ০৬.০৫.২০১৬)। নারী কেলেংকারির অভিযোগ প্রকাশিত হয়ে পড়ায় গত বছর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয় সামুদ্রিক বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের একজন প্রভাষকের দেয়া প্রলোভন ও অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হয়ে এক ছাত্রী ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ইন্সটিটিউট থেকে বহিষ্কারের হুমকি এবং জীবননাশের হুমকি প্রদানের লিখিত অভিযোগ আনে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযোগটি যৌন নির্যাতনবিষয়ক সেলে না পাঠিয়ে আইন অনুষদের সাবেক ডিনসহ তিন সদস্যবিশিষ্ট গঠিত কমিটিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে একাডেমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি প্রদান এবং অনৈতিক প্রস্তাব দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। বিভাগের স্নাতক পর্যায়ের দুই ছাত্রী তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির লিখিত অভিযোগ দাখিলের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭১তম সিন্ডিকেট সভা ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বেশ কয়েকজন শিক্ষকও বিভিন্ন সময় এ ধরনের ঘটনায় শাস্তি পেয়েছেন। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কিছু যৌন অপরাধের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও অভিযুক্তদের শাস্তির দৃষ্টান্ত নেই। গঠিত তদন্ত কমিটি এ রকম একটি অভিযোগ তদন্ত করে শাস্তির সুপারিশ করলে অভিযুক্ত শিক্ষক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগেই উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নৈতিক স্খলনের তথ্য উপস্থাপন না করেও বলা যায়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন অপরাধ বেড়েছে এবং এমন অপরাধে জড়িত হয়ে ওই শিক্ষকরা তাদের সম্মানের জায়গাটিকে ভূলুণ্ঠিত করেছেন।

নৈতিক স্খলনের মধ্যে কেবল যৌন কেলেংকারিই পড়ে না। অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের নম্বর বেশি দেয়া, স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, অন্যের লেখা নকল করে প্রবন্ধ ও অভিসন্দর্ভ রচনা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। যৌন অপরাধ বা অন্য কোনো একাডেমিক দুর্নীতি করে ধরা পড়লে শিক্ষকদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করার কথা। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা হয় না। অভিযুক্তের দলীয় পরিচয়কে বিবেচনায় নেয়ার কারণে অনেক সময় সংঘটিত অপরাধের তদন্ত সঠিক পথে পরিচালিত হয় না। তদন্তের ধীরগতির কারণে অনেক তদন্তে ভাটা পড়ে।

একথা সত্য, এখনও অধিকাংশ শিক্ষকই ভালো। তারা ছাত্রছাত্রীদের নিজের ছেলেমেয়ের মতোই ভালোবাসেন। তবে এ বাস্তবতাও স্বীকার্য, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যৌন হয়রানিকারী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি করতে হলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটিকে অধিকতর সক্রিয় করা দরকার। আর দরকার এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। যৌন হয়রানির শিকার হলে কী করতে হবে, সে সম্পর্কে অনেক শিক্ষার্থী কিছুই জানে না। নবাগত শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ভালোভাবে অবহিত করা জরুরি। প্রভাষক নিয়োগের সময় একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি প্রার্থীর নৈতিকতা সম্পর্কিত তথ্য আমলে নিলে ভালো হয়। জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ না নিলে উচ্চশিক্ষাঙ্গনে যৌন অপরাধ আরও বাড়বে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির উচিত এ বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষার্থীবান্ধব নিরাপদ এলাকায় রূপান্তরিত করতে অধিকতর সক্রিয় হওয়া।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

akhtermy@gmail.com